OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 394 - 401
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 394 - 401
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাসে অরণ্য ভাবনা

পিংকী রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID : pinkiroy3091@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Forest, Forest dwellers, Forest-daughter, nature-consciousness, peace of mind, refuge.

Abstract
In spite of the fact that forest has been the background to many Bengali novels, it was introduced as a character for the very first time by Bibhutibhushan Bandopadhyay, having inculcated in it a unique juxtaposition of forest-consciousness and nature-consciousness. It is something entirely new and different from what the usage has been, not just in his novels, but in the total spectrum of Bengali literature. This thing has been veritably and authentically carried forward by Bandopadhyay's able successor- Buddhadeb Guha. However, in terms of generating nature-consciousness and using it as a character, there is more dissimilarity in the works of Guha and Bandopadhyay than similarity. While to Bibhutibhushan Bandopadhyay, nature is equivalent to God; he found pantheism in nature. Sometimes, nature is portrayed as a beloved, whereas sometimes as a child. By contrast, Buddhadeb Guha saw forest with respect to citizen-consciousness with an intelligent eye. Therefore, in his novels, we encounter psychology, sexuality and desires of women. Although a master investor of the theme of nature in almost all his novels, we find its most effective employment in one of his most acclaimed novels- Aranyak. Keeping the alike things between Bandopadhyay's and Guha's treatment of nature in mind, Aranyak and some of Guha's forest-centric novels are brought together for the sake of comparative discussion.

Discussion

অরণ্য ও মানুষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মনুষ্যজাতির সৃষ্টিলগ্ন থেকেই অরণ্য মানুষের আশ্রয়স্থল। অরণ্য মানুষকে দিয়েছে আশ্রয়, বাঁচার রসদ, মানসিক শান্তি ও ঔদার্য। তাই একুশ শতকে এসে সভ্যতার অগ্রগতি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নমূলক বুলি কপচালেও মানসিক শান্তির খোঁজে বা ক্লান্তি নিরসনের জন্য মানুষকে ছুটে যেতে হচ্ছে অরণ্যে। অরণ্য ও মানুষের এই সংলগ্নতার ছবি সাহিত্যেও ধরা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি বিভিন্নভাবে অরণ্যের বর্ণনা এসেছে।

রামায়ণ-মহাভারত ও মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্য থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় অরণ্য ও মানুষের সহাবস্থান দেখেছি। বর্তমানেও সেই ধারা সমানভাবে অব্যাহত।

বাংলা সাহিত্যে অরণ্যকে পটভূমি করে লেখালেখি হলেও অরণ্যকে একটি চরিত্র হিসেবে প্রথম সাহিত্যে উপস্থাপন করেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *আরণ্যক* (১৯৩৯) উপন্যাসে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তো বটেই; সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ এক নতুন ভাবনার সূচনা। এই ভাবনায় তাঁর যথার্থ উত্তরসূরি ছিলেন বুদ্ধদেব গুহ। বলা যায় গুরু-শিষ্য। বুদ্ধদেব গুহর অরণ্য-ভাবনা বিভূতিভূষণ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তিনি নিজের বহু রচনায় বিভূতিভূষণের ভাবনার গাঢ়তা ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। নিজে একাধিকবার *আরণ্যক* ও *চাঁদের পাহাড়* পড়েছেন এবং মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছেন। তিনি বলেছেন, -

> “আরণ্যক শুধু অরণ্যের দলিল নয়, আমাদের দেশের সাধারণ গরীব-গুর্বো মানুষের চালচিত্রও।”[১]

তিনি আরও বলেছেন, -

> “বনেজঙ্গলে তো আমি কম ঘুরিনি! বিভূতিবাবুর থেকে অনেক বেশি ঘুরেছি কিন্তু আমি তো বিভূতিবাবুর ‘আরণ্যকে’র মত একটি উপন্যাস লিখতে পারব না। আমি আফ্রিকাতে গিয়েছি বহুবার কিন্তু বিভূতিবাবু ইছামতীর পারে বারাকপুরে থেকে চাঁপদানীতে স্কুলের শিক্ষকতা করে যে ‘চাঁদের পাহাড়’ লিখেছিলেন সেইরকম একটি বই আমি আফ্রিকাতে দুবছর থাকলেও ফিরে এসে লিখতে পারতাম না। বিভূতিভূষণ যে কত বড় মাপের লেখক ছিলেন এটাই তাঁর প্রমাণ।”[২]

এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য আমরা উপন্যাসের ধারাকেই নির্বাচন করেছি। বিভূতিভূষণের অনেক উপন্যাসেই প্রকৃতি উঠে এলেও মূলত *আরণ্যক* উপন্যাসেই অরণ্য স্বমহিমায় উঠে এসেছে। তাই বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* উপন্যাস এবং বুদ্ধদেব গুহর কিছু অরণ্যকেন্দ্রিক উপন্যাস যেমন, *কোয়েলের কাছে* (১৯৭০), *কোজাগর* (১৯৮৪), *সবিনয় নিবেদন* (১৩৯৬), *শালডুংরি* (১৯৮৮) প্রভৃতি উপন্যাস এই প্রবন্ধের মূল আধার।

বিভূতিভূষণ ও বুদ্ধদেব উভয়ই অরণ্য ও আরণ্যক মানুষদের জীবনগাথা গেয়েছেন। দুজনই অরণ্যের রূপ-সৌন্দর্য ও তার মহিমা ব্যক্ত করেছেন। তবে বুদ্ধদেব কিছু নতুন বিষয়ের সংযোজন করেছেন। তাঁর উপন্যাসে আমরা পাই অগণিত গাছপালা, পশু-পাখির নাম। তার পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে শিকার-সংক্রান্ত নানা বিষয়। রয়েছে উদ্ভিদতত্ত্বের কথা যেমন, সমস্ত উদ্ভিদ জগতে ফুলই পরিপূর্ণতার ও সার্থকতার প্রতীক। তাই সাহিত্যে, উপমাতে আমরা দেখতে পাই মঞ্জরিত, পুষ্পিত এসব কথা। কিন্তু বাঁশের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। বাঁশগাছে ফুল এলে তার সঙ্গে যমদূতের পদধ্বনিও শোনা যায়। ফুল ফুটিয়েই বাঁশ তার অস্তিত্ব অনস্তিত্বে পর্যবসিত করে। (*কোজাগর* উপন্যাস) বিভূতিভূষণ অরণ্যের অন্তরালে ‘ভৈরবী’, ‘সুরসুন্দরী’, ‘কালীমূর্তি’ প্রত্যক্ষ করেছেন। সন্ন্যাসীর ধ্যানমগ্ন রূপ যেমন তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছে তেমনি কতগুলি নাম, গোত্র, রূপহীন নগন্য জংলি কাঁটাগাছের ফুলের মধ্যেও তিনি বসন্তের রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রকৃতির দৈবী ও মোহিনী রূপে তিনি বিভোর ছিলেন, -

> “...কত সন্ধ্যা আসিল অপূর্ব রক্তমেঘের মুকুট মাথায়, দুপুরের খরতর রৌদ্র আসিল উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশে, গভীর জ্যোৎস্নাবরণী সুরসুন্দরীর সাজে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশভরা তারার মালা গলায়— অন্ধকার রজনীতে কাল-পুরুষের আগুনের খড়্গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালিমূর্তিতে।”[৩]

কখনও বা তিনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখেছেন, -

> “কি গম্ভীর শোভা উঁচু ডাঙার উপরকার অরণ্যের! কি ধ্যানস্তিমিত, উদাসীন, বিলাসহীন, সন্ন্যাসীর মতো রুক্ষ বেশ তাঁর, অথচ কি বিরাট!”[৪]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 394 - 401
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঋতু-বৈচিত্র্যে প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতা বিভূতিভূষণকে আবেগ-মুগ্ধ করেছে। এক বর্ষার অনুভূতি, -

> "কি অপূর্ব বর্ষার দৃশ্য দেখিলাম সেই অরণ্য-প্রান্তরে! মেঘে দিগন্তের শৈলমালা নীল, থম্‌কানো কালো বিদ্যুৎগর্ভ মেঘে আকাশ ছাইয়া আছে, ক্বচিৎ পথের পাশের শাল কি কেঁদ শাখায় ময়ূর পেখম মেলিয়া নৃত্যপরায়ণ, পাহাড়ী ঝরনার জলে গ্রাম্য বালক-বালিকা মহা উৎসাহে শাল-কাটির ও বন্য বাঁশের ঘুনি পাতিয়া কুচো মাছ ধরিতেছে, ধূসর শিলাখণ্ড ভিজিয়া কালো দেখাইতেছে, তাহার উপর বসিয়া মহিষের রাখাল কাঁচা শালপাতার লম্বা বিড়ি টানিতেছে।"[৫]

বিভূতিভূষণ সরল সৌন্দর্য অঙ্কনে বিশ্বাসী। মানব চরিত্রের ক্ষেত্রে যেমন দেখি অপুর বয়স বেড়েছে কিন্তু বালকসুলভ আচরণ তার থেকে গেছে। প্রকৃতির মধ্যেও তিনি সেই সরল সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন। জীবনকে তিনি খেলাঘর হিসেবে দেখেছেন, সংগ্রামক্ষেত্র নয়। তাই জীবনের জটিল ও দুর্গম দিকগুলি তাঁর বর্ণনার বাইরেই থেকেছে। সবকিছুকে তিনি নিজের ছাঁচে সরল করে প্রকাশ করেছেন। সঙ্গত কারণেই প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, -

> "পাহাড়পর্বত, অরণ্য ও বন্ধুর ভূখণ্ড---কোনোটারই ভীমকান্ত সৌন্দর্যকে কবি দেখান নাই, কারণ তিনি দেখেন নাই। তাঁহাদের স্নিগ্ধ ও সুন্দর দিকটাই তিনি দেখিয়াছেন এবং আঁকিয়াছেন। মানব-প্রকৃতির দুর্দাম বৃত্তিগুলিকে যেমন তিনি অঙ্কিত করেন নাই, তাহাদের প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র রূপটাকেই যেমন তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তেমনি প্রকৃতি সম্বন্ধেও তিনি এই নিয়ম অনুসরণ করিয়াছেন।"[৬]

তাই তুলনামূলকভাবে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর বা রুক্ষ রূপ কম ধরা দিয়েছে। কিন্তু বুদ্ধদেব গুহর বর্ণনায় অরণ্যের সামগ্রিক রূপ ধরা দিয়েছে। সেখানে প্রকৃতির শান্ত-স্নিগ্ধ-সুন্দর রূপ যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি ভয়ঙ্কর বীভৎসতাও স্থান পেয়েছে। যেমন, আরণ্যক মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু বুনো শুয়োর ও ভালুক সম্পর্কে *কোয়েলের কাছে* উপন্যাসে তিনি লিখেছেন,

> "বিনা প্ররোচনায়, বিনা কারণে এরা যখন তখন আক্রমণ করে বসে। তাড়া করে মাটিতে ফেলে, মানুষের উরু অবধি ধারালো দাঁতে চিরে ফালা ফালা করে দেয় শুয়োর। সেরকমভাবে শুয়োর চিরলে মানুষকে বাঁচানোই মুশকিল হয়। আর ভাল্লুক তো আরও ভাল। যখন দয়া করে প্রাণে না মারে, তখন সে এক খাবলায় হয় কান, নয় ঠোঁট, নাক ইত্যাদি খুবলে দেয়। তাছাড়া নখ দিয়েও একেবারে ফালা ফালা করে দেয়।"[৭]

বিভূতভূষণের *আরণ্যক* উপন্যাসের শুরুতে সত্যচরণকে দেখেছি একজন শহুরে যুবক হিসেবে। তিনি কর্মসূত্রে জঙ্গলে আসেন। প্রথমে তাঁর, "এই অরণ্যভূমির নির্জনতা যেন পাথরের মতো বুকে চাপিয়া আছে"[৮] এমনটা মনে হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন থাকার পরেই তাঁর অনুভূতি পালটে যেতে দেখি, -

> "...এই বর্বর রুক্ষ বন্য প্রকৃতি আমাকে তাঁর স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, শহরের খাঁচার মধ্যে আর দাঁড়ে বসিয়া থাকিতে পারিব কি? এই পথহীন প্রান্তরের শিলাখণ্ড ও শালপলাশের বনের মধ্য দিয়া এই রকম মুক্ত আকাশতলে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় হু-হু ঘোড়া ছুটাইয়া চলার আনন্দের সহিত আমি দুনিয়ার কোনো সম্পদ বিনিময় করিতে চাহি না।"[৯]

বুদ্ধদেব গুহরও অনেক উপন্যাসে দেখি, প্রধান চরিত্রেরা কর্মসূত্রে অরণ্যে গেছেন এবং সেখানে দীর্ঘসময় থাকতে থাকতে অরণ্যের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা জেগেছে তাঁদের মনে। যেমন - *কোয়েলের কাছে*-র লালসাহেব, *কোজাগর*-এর বাঁশবাবু, *সবিনয় নিবেদন*-এর রাজর্ষি, *সাসান্‌ডিরি*-র বুজুবাবু প্রমুখ। সত্যচরণের মতোই এঁদেরও একই অনুভূতি। *কোয়েলের কাছে*-তে দেখি, কথক লালসাহেব কর্মসূত্রে রুমান্ডির জঙ্গলময় পরিবেশে এসে চারিদিকে শুধু বন আর পাহাড় দেখে নিজেকে নির্বাসিত মনে করেছেন। তাঁর মনে আশঙ্কা জাগে, -

> "বেশি মাইনের লোভে পড়ে এই ঘন জঙ্গলে এসে পাণ্ডব-বর্জিত পাহাড়ে বেঘোরে বাঘ-ভাল্লুক ডাকাতের হাতে প্রাণটা না যায়।"[১০]

কিন্তু চুক্তিভিত্তিক কাজ শেষ হওয়ায় রুমান্ডি ছেড়ে কলকাতা ফিরে যাওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হলে কথক অনুভব করেছেন, -

> "কলকাতার সমস্ত জীবনের বিনিময়ে আমি এখানের একটি দিনও দিতে রাজি নই। এখন আমাকে এখান থেকে ছিনিয়ে নেওয়া মানে নবজাত শিশুরই মতো প্রকৃতি মায়ের নাড়ি থেকে সভ্যতার ছুরি দিয়ে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে সভ্য ও ভণ্ড কলকাতার আবর্জনার স্তূপে আমাকে নিক্ষেপ করা।"[১১]

একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি আমরা *কোজাগর*-এর বাঁশবাবুর মুখ থেকেও শুনি।

আরণ্যক-নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের থেকে এক কদম এগিয়ে পা ফেলেছেন বুদ্ধদেব গুহ। বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* - এ জঙ্গলমহল ছেড়ে আসার পূর্বে সত্যচরণের হৃদয়ে বাসনা জেগেছে আজীবন সেখানে থেকে যাওয়ার। অরণ্য-কন্যা ভানুমতীকে বিবাহ করে সুখে সংসার পাতার। সত্যচরণের ভাবনা, -

> "এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম। এই মাটির ঘরের জ্যোৎস্না-ওঠা দাওয়ায় সরলা বন্যবালা রাঁধিতে রাঁধিতে এমনি করিয়া ছেলেমানুষী গল্প করিত— আমি বসিয়া বসিয়া শুনিতাম।"[১২]

কিন্তু তা ভাবনাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। বরং তিনি 'যেতে নাহি দিব হায়, তবু যেতে দিতে হয়' এমন দর্শন দ্বারা নিজ মনকে সান্ত্বনা দিয়ে ভোলানোর চেষ্টা করেছেন। কলকাতা অভিমুখে রওনা হয়েছেন এবং নিজের মনকে বুঝিয়েছেন, -

> "এই প্রেম যে একবার জেনেছে, সে কখনো ঘর-সংসার করতে পারবে না, শহরে ফিরতে পারবে না— ঠিক যেভাবে মিলনমুহূর্তে প্রেমিক ভাবে প্রেমিকাকে সে কখনো ছেড়ে থাকতে পারবে না। তবু ছেড়ে দিতে হয়, তবু চলে যায়।"[১৩]

নিজে জংলি জীবন বরন করার সাহস দেখাতে পারেননি।

কিন্তু বুদ্ধদেব গুহ তা করে দেখিয়েছেন। তাঁর *কোজাগর* উপন্যাসে বাঁশবাবুর মুখ থেকে শুনতে পাই, -

> "আদিমতম এই আশ্চর্য মেয়ের প্রেমে পড়ে গেছি যে আমি। ...এই মায়াবিনীর জালে যে একবার ধরা দিয়েছে, তার পালাবার সব পথই বন্ধ। এ জীবনের মতো জঙ্গলের সঙ্গে বুঁদ হয়ে জংলি হয়ে গেছি।"[১৪]

সবিনয় নিবেদন উপন্যাসেও রাজর্ষির মুখ থেকে শুনতে পাই, "জঙ্গলেই আমার বাস। জঙ্গলই আমার জীবন।"[১৫] *কোজাগর* উপন্যাসে বাঁশবাবু কর্মসূত্রে ভালুমারে গিয়ে সেখানকার প্রকৃতি ও মানুষকে ভালোবেসে সেই পরিবেশের একজন হয়ে ওঠার জন্য অরণ্য-কন্যা তিতলিকে বিবাহ করে জংলি জীবন বরণ করেছেন। *শালডুংরি* উপন্যাসেও দেখি বাঙালিবাবুকে। তিনি অনেক পড়াশোনা করা মানুষ। যুবক বয়সে স্কটল্যান্ডের ম্যাকলাক্কিকে 'হ্যাগেস'-এর গান পর্যন্ত শুনিয়েছেন। তিনি ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে বেশ কিছুদিন ছিলেন। পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন একজন পদার্থবিদ। মধ্যপ্রদেশের শালডুংরির জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে সেই বনজঙ্গলকে ভালোবেসে সেখানেই থেকে যান। জংলি মুন্ডা মেয়ে হনসোকে বিয়ে করে মুন্ডাদের মতোই জীবনযাপন করেন। *পারিধী* উপন্যাসেও চন্দ্রকান্ত একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক। নিজের বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করে জঙ্গলের জীবন বেছে নিয়েছেন। আরণ্যক নারী চন্দনীকে বিবাহ করেছেন। যদিও পরে নিজের দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ না-থেকে সামগ্রিক আরণ্যক অসহায় মানুষদের জন্য নিজের জীবন সঁপে দিয়েছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 394 - 401
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দুজনের কেউই মানুষকে বর্জন করে প্রকৃতির সৌন্দর্য আস্বাদন করেননি। উভয়ের অধিকাংশ উপন্যাসে গাছপালা ও অরণ্যের সঙ্গে চরিত্রদের একাত্মতা লক্ষ করা যায়। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মধ্যে জীবনের লক্ষণ ও মনুষ্য-স্বভাবের প্রকাশ দেখেছেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে প্রেমিকার প্রেম-ঈর্ষা, অনুরাগ ও অভিমান প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন *আরণ্যক*-এ আমরা দেখি বিচিত্ররূপী অরণ্যপ্রকৃতি সুন্দরী নায়িকার মতো মানুষের একনিষ্ঠ মনোযোগ আশা করে, -

> "অনেক দিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না। আর কি ঈর্ষার স্বভাব প্রকৃতিরানীর— প্রকৃতিকে যখন চাহিব, তখন প্রকৃতিকে লইয়াই থাকিতে হইবে, অন্য কোনো দিকে মন দিয়াছি যদি, অভিমানিনী কিছুতেই তাঁর অবগুণ্ঠন খুলিবেন না।"[১৬]

এই একই বার্তার প্রতিধ্বনি আমরা বুদ্ধদেব গুহর লেখাতেও শুনতে পাই, -

> "বনকে সময় না দিলে, চোখ, কান, নাক, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তার প্রতি একাগ্র না হলে সে কারো কাছেই মন খোলে না।"[১৭]

উভয়ই অনুভব করেছেন, একমনা হয়ে প্রকৃতিকে নিয়ে ডুবে থাকলে তার সবরকম আনন্দ, সৌন্দর্যের বর আমাদের ওপর অজস্রধারায় বর্ষিত হবে। দিনরাত মোহিনী প্রকৃতিরানী আমাদের শতরূপে মুগ্ধ করবে। আমাদের নতুন দৃষ্টি জাগ্রত করে তুলবে। আমাদের মনের আয়ু বাড়াতে সাহায্য করবে। তবে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে অরণ্য প্রকৃতি এক সুন্দরী রমণী। যাকে তিনি সুন্দর পোষাকে, সুগন্ধি মহিমায় চাঁদনীরাতে রহস্যময়তার প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। সেই রহস্যময়ীকে বুদ্ধদেব গুহ রমণ করেছেন। তার সমস্ত রহস্য উন্মোচন করেছেন। বুদ্ধদেব গুহর ভাবনায় যৌনতা যুক্ত হয়েছে। এখানেই বিভূতিভূষণের থেকে তাঁর ভাবনা স্বতন্ত্র। যেমন, *কোজাগর*এ দেখি, -

> "পালামৌর এই বনে-পাহাড়ে একরকমের গাছ হয়, চিল্‌বিল্‌ তার নাম। ভারি মসৃণ উজ্জ্বল তাদের কাণ্ড। প্রায় ইউক্যালিপটাসের মতোই। এই গাছগুলোকে মনে মনে উল্টো করে নিয়ে দেখলে গা শিরশির করে। প্রতিটি ডালের সংযোগস্থলকে মনে হয় নারীর জঘন এবং কাণ্ডগুলোকে মনে হয় ঊরু। কত বিচিত্র মাপের ও গড়নের হস্তিনী, পদ্মিনী, শঙ্খিনী নারীরা এইসব জঙ্গলে বৃক্ষীভূত হয়ে আছে যে, যদি কেউ তেমন করে চেয়ে দেখেন, তাহলেই তাঁর চোখে পড়বে।"[১৮]

আরণ্যক-এ আমরা দেখি সত্যচরণের নিজ হাতে জঙ্গল ধ্বংসের ছাড়পত্র দেওয়ায় সেই অপরাধবোধ থেকে তিনি কাহিনির অবতারণা করেছেন। তাঁর মুখ থেকে আমরা শুনি, -

> "...আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়। তাই এই কাহিনীর অবতারণা।"[১৯]

সুতরাং এ কথা বলতেই হয় যে, বিভূতিভূষণে অপরাধবোধ থাকলেও জঙ্গল ধ্বংসকে রোধ করার তেমন কোনও বার্তা দেননি। কিন্তু বুদ্ধদেব গুহ অরণ্য-ধ্বংসের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

আরণ্যক - এ রাজস্ব বাড়ানোর কারণে অরণ্য ধ্বংস করে লবটুলিয়ার জমিদারের হয়ে প্রজাবসতি স্থাপন করার আক্ষেপ থেকে সত্যচরণ মুক্তি খুঁজেছে অরণ্যের নির্জনে 'বিউটি স্পট' সংরক্ষণ করার বাসনায়। এখানে দেখি যুগলপ্রসাদকে। সম্পূর্ণ বিনাস্বার্থে একটা বিস্তৃত বন্যভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করেছেন তিনি। নিজে সে নিতান্ত গরিব, অথচ শুধুমাত্র বনের সৌন্দর্য-সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টায় বনে বনে ভালো ফুল ও লতার বীজ ছড়ায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 394 - 401
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যুগলপ্রসাদের এই নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারা কথক প্রভাবিত হয়েছেন এবং নিজেও এই কাজে সামিল হয়েছেন। তার মুখ থেকে আমরা শুনি, -

> "দুজনে মিলিয়া এ বনকে নানা নতুন বনের ফুলে, লতায়, গাছে সাজাইব, সেদিন হইতে ইহা আমাকে যেন একটা নেশার মতো পাইয়া বসিল।"[২০]

লবটুলিয়ায় সরস্বতীকুণ্ডীতে জমির প্রজাবিলিতে মন থেকে সায় পাননি সত্যচরণ। তিনি জানেন, এখানে প্রজা বসালেই তারা প্রকৃতির এমন সুন্দর কুঞ্জবনকে নষ্ট করে সেখানে ফসল রোপণ করবে, ঘর-বাড়ি বেঁধে বসবাস শুরু করবে। তাতে করে —

> "এই নির্জন শোভাময় বন্য প্রান্তর, অরণ্য, কুণ্ডী, শৈলমালা জনপদে পরিণত হইবে, লোকের ভিড়ে ভয় পাইয়া বনলক্ষ্মীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইবেন— মানুষ ঢুকিয়া এই মায়াকাননের মায়াও দূর করিবে, সৌন্দর্যও ঘুচাইয়া দিবে।"[২১]

তবে সত্যচরণের প্রকৃতি-চেতনায় অনেকটা পশ্চিমি ধাঁচ মিশ্রিত আছে যেখানে "কর্মক্লান্ত শহরের মানুষ মাঝে মাঝে আসিয়া প্রকৃতির সাহচর্যে নিজেদের অবসন্ন মনকে তাজা করিয়া লইয়া ফিরিত।"[২২]

শহুরে শিক্ষিত মানুষের বিনোদনের উপকরণ হিসেবে তিনি পশ্চিমি অরণ্য সংরক্ষণকে মডেল করে পার্ক গড়ে তোলার কথা ভেবেছেন যেমন- 'ক্যালিফোর্নিয়ায় যোসেমাই ন্যাশনাল পার্ক', 'দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে ক্রূগার ন্যাশনাল পার্ক', 'বেলজিয়ান কঙ্গোতে আছে পার্ক ন্যাশনাল আলবার্ট' প্রভৃতি। ভারতের অরণ্যে দৃশ্যমান তার মুগ্ধতার আবেশকে সবসময় মিলিয়ে নিতে চেয়েছেন ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে। যেমন, -

> ক. বাংলা দেশের এত নিকটেই এরূপ সম্পূর্ণ জনহীন অরণ্যপ্রান্তর ও শৈলমালা আছে, যাহা সৌন্দর্যে আরিজোনার পাথুরে মরুদেশ বা রোডেশিয়ার বুশভেল্ডের অপেক্ষা কম নয় কোনো অংশে...।[২৩]
>
> খ. এ যেন ফিল্‌মে দেখা দক্ষিণ আমেরিকার আরিজোনা বা নাভাজা মরুভূমি কিংবা হড্‌সনের পুস্তকে বর্ণিত গিলা নদীর অববাহিকা অঞ্চল।[২৪]

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে শিক্ষিত, শহুরে মানুষের স্বার্থে অরণ্য সৌন্দর্য রক্ষা ও বৃদ্ধির ভাবনা যতটা প্রাধান্য পেয়েছে ততটা অসহায় আরণ্যক মানুষদের অরণ্যের প্রতি অধিকার বা তাদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি জোরদার হয়নি। তাই আরণ্যক মানুষদের অরণ্যের সৌন্দর্যের প্রতি উপেক্ষাকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর কথায় —

> "এখানকার মানুষে গাছপালার সৌন্দর্য বোঝে না, রম্য ভূমিশ্রীর মহিমা দেখিবার চোখ নাই, তাহারা জানে পশুর মতো পেটে খাইয়া জীবনযাপন করিতে।"[২৫]

কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁর উপন্যাসগুলিতে একথা স্পষ্টই বলেছেন যে - অরণ্যের প্রতি প্রথম ও প্রধান অধিকার আরণ্যক মানুষদের। এবং পাশাপাশি তিনি একথাও জোর দিয়ে বলেছেন, শহুরে মানুষরা যতই আধুনিকতার বুলি কপচাক, একদিন তাদের অরণ্যের বুকেই আশ্রয় নিতে হবে। আরণ্যক মানুষদের অরণ্যের সৌন্দর্যের প্রতি উদাসীনতার বিষয়টি তিনি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তাদের অসহায়তা অনুভব করেছেন। তাই তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাই, -

> "জঙ্গলের মধ্যে যারা বাস করে, তারা তাদের পরিবেশ ও জগৎ সম্বন্ধে এতো কম উৎসুক যে নিজের চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করাও মুশকিল। ...হয়তো শরীরের যে ন্যাক্কারজনক অংশ যার নাম জঠর, সেই জঠরের দাবাগ্নিতেই ওদের আর-সব শুভবোধ ও ঔৎসুক্য বুঝি চাপা পড়ে গেছে চিরতরে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি ঐ একই চিন্তা। অন্ন চিন্তা।"[২৬]

অরণ্যের সঙ্গে আরণ্যক মানুষদের সম্পর্ক যে দাতা-গ্রহীতার ও প্রয়োজনের, তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। অরণ্য জ্বালানি দেয়, নানা খাদ্যসামগ্রী দেয়। আর তাঁরা তার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকেন। কাজেই বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে আরণ্যক সৌন্দর্য উপভোগের প্রসঙ্গ তো আছেই কিন্তু প্রয়োজনের বিষয়টিও প্রধান হয়ে উঠেছে। অরণ্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে দুজন সাহিত্যিকের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দুইই পরিলক্ষিত। বিভূতিভূষণ অরণ্যকে দেখেছেন ঈশ্বর-উপাসনার মতো। কখনও দেখেছেন প্রেমিকা রূপে আবার কখনও দেখেছেন শিশুসুলভ দৃষ্টিতে। কিন্তু বুদ্ধদেব নাগরিক-চেতনাকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিতে অরণ্যকে দেখেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসে নরনারীর মনস্তত্ত্ব, যৌনতা, কামনা-বাসনা প্রভৃতিও উঠে এসেছে।

দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও দুজন সাহিত্যিকই পাঠক-মনে অরণ্য-চেতনা ও প্রকৃতি-চেতনা জাগাতে সচেষ্ট হয়েছেন। মানুষের নিজেদের প্রয়োজনেই অরণ্য প্রকৃতিকে রক্ষা করা প্রয়োজন সেই বার্তাই তাঁরা তাঁদের সাহিত্যকর্মের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

Reference:

১. বসু, তাপস, *আরণ্যকের অনন্যতা,* (সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ০৯, পৃ. ১৯০
২. তদেব, পৃ. ১৯১
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক,* প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ২৩
৪. তদেব, পৃ. ৭৯
৫. তদেব, পৃ. ১৬১
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., একাদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪০১, কলিকাতা ৭৩, পৃ. ৬
৭. গুহ, বুদ্ধদেব, *কোয়েলের কাছে,* প্রথম আনন্দ সংস্করণ মাঘ ১৩৮৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, পৃ. ৬০
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক,* প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১৭
৯. তদেব, পৃ. ৫৮
১০. গুহ, বুদ্ধদেব, *কোয়েলের কাছে,* প্রথম আনন্দ সংস্করণ মাঘ ১৩৮৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, পৃ. ১৩
১১. তদেব, পৃ. ১৭৯
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক,* প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ২২১
১৩. তদেব, পৃ. ৮৭
১৪. গুহ, বুদ্ধদেব, *কোজাগর,* প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ২২
১৫. গুহ, বুদ্ধদেব, *সবিনয় নিবেদন,* প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, পৃ. ২৬
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক,* প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৮৬
১৭. গুহ, বুদ্ধদেব, *সবিনয় নিবেদন,* প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, পৃ. ১৩
১৮. গুহ, বুদ্ধদেব, *কোজাগর,* প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১৭৪
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক,* প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রস্তাবনা, পৃ. ৮

২০. তদেব, পৃ. ১০১
২১. তদেব, পৃ. ১০৩
২২. তদেব, পৃ. ১০৪
২৩. তদেব, পৃ. ৫৮
২৪. তদেব, পৃ. ৫৮
২৫. তদেব, পৃ. ১৯০
২৬. গুহ, বুদ্ধদেব, *কোজাগর*, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১৮